ঃ এই সংখ্যায় ঃ
লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ, জাতীয় বিজ্ঞান দিবস মূল্যবোধের নাট্যমেলা রিপোর্ট

# বিজ্ঞান অন্বেষক

ঃ যোগাযোগ ঃ
চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ৯৪৩৪১১০৯৬৯, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা ৯৪৭৭০৬৪৭০৪, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ৯৬০৯৭৪২৯৯৭, জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব ৯৪৭৪৪১৭১৭৮, শান্তিপুর সায়েন্স ক্লাব ৯২৩২৮২৮৩৩৩। কলিকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা-৯৪৭৭৫৮৯৪৫৬

বর্ষ-১০ সংখ্যা - ২ মার্চ-এপ্রিল/২০১৩ RNI No. WBBEN/03/11192 মূল্য : ২ টাকা

## অরণ্য সম্পদ ধ্বংস হচ্ছে

সংরক্ষিত বনাঞ্চলগুলি পরিবেশ রক্ষার জন্য রাজ্যের পরিবেশ দপ্তরের এক আদেশনামায় জানানো হয়েছে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ১ কিলোমিটারের মধ্যে কোন হোটেল বা রেস্তোরা তৈরী করা যাবে না। নির্দেশনামায় আরো জানানো হয়েছে পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র লাগবে। বনের পরিবেশ তথা প্রাকৃতিক সম্পদ, জৈব বৈচিত্র্য ও পরিবেশ দূষণ বিষয়ে সমীক্ষামূলক কয়েকটি তথ্য ঃ—

১) বনের লাগোয়া অঞ্চলের গাছ ধ্বংস করা হচ্ছে, জলাভূমি বুজিয়ে হোটেল, রিসোর্ট বা বড় বড় বাড়ী বানানো হচ্ছে। জঙ্গল কেটে রাতারাতি সাফ করে রাস্তা বানানো হচ্ছে।

২) বক্সা টাইগার রিসার্ভ ফরেস্ট (বি.টি.আর) এ কোর এরিয়ায় খাদ্য-খাদক সম্পর্ক নষ্ট হচ্ছে, ফলে বন্য প্রাণীদের খাবারের অভাব ঘটছে। বন্য প্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে। জঙ্গলের ঘনত্ব বাড়ানো দরকার

এরপর 2 পাতায়

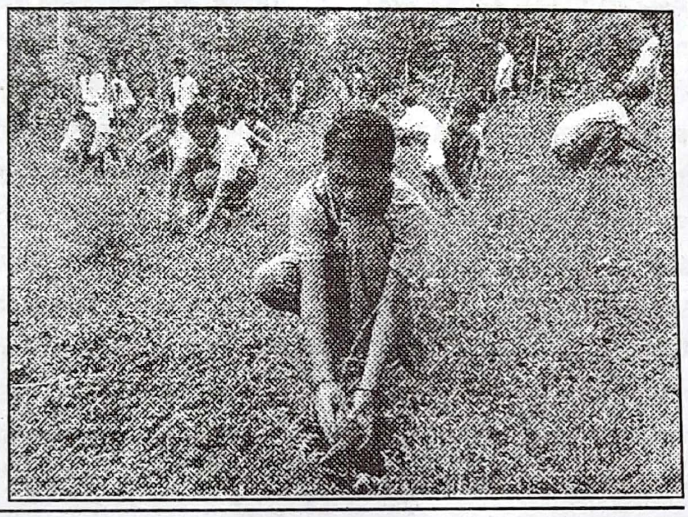

## রাসায়নিক অস্ত্র ও একটি জীবন

প্রাচীনকাল থেকেই অন্যান্য জীবজন্তুর মতো মানুষও বিভিন্ন সময়ে লিপ্ত হয়েছে পারস্পরিক সংঘর্ষ ও হানাহানিতে। তা কোনো কোনো সময়ে জৈবিক তাগিদে আবার কখনো হয়ত বা কোনো স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে। এই সংঘর্ষ বা হানাহানিতে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র ব্যবহৃত হলেও মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার দেখা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দের প্রাচীন গ্রীসে। এই সময় স্পার্টারা এথেন্স জয় করার লক্ষ্যে জ্বালানী কাঠের বোঝার সাথে পিচ এবং সালফার বেঁধে এথেন্স শহরের দেওয়ালের

এরপর 6 পাতায়

## জাতীয় প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবস

সাথী সভাপতি ও উপস্থিত বিজ্ঞানমানসিকতা প্রসারে ও প্রচার আন্দোলনে অঙ্গীকারবদ্ধ ব্যক্তিবর্গ, আমন্ত্রিত বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, আপনাদের সকলকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন।

২৮ নভেম্বর পালিত হল তৃতীয় জাতীয় প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবস। পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি কর্মসূচী পালনের লক্ষ্যেই আজকের সভা আহূত হয়েছে। ১৯৭৭ সালে জীবনের সকল ক্ষেত্রে চিন্তায় এবং আচরণে বিজ্ঞান-চেতনা এবং যুক্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কলকাতায় একটি সংগঠনের জন্য হয়। নাম, গণদর্পণ। গণদর্পণ মতাদর্শে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও কুসংস্কারের বিরোধী। বিজ্ঞানমানসিকতা এবং যুক্তিবাদের প্রসার তার লক্ষ্য।

জাতীয় প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবসের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আমাদের অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। ২০০৫ সালের ১৪ অক্টোবর জেনেভায় অনুষ্ঠিত হয় প্রথম আন্তর্জাতিক প্রত্যঙ্গ দান দিবস। প্রত্যঙ্গ দানকে কেন্দ্র করে চলে অনৈতিক ব্যবসা। সেই

এরপর 5 পাতায়

## 'মূল্যবোধের নাট্যমেলা'

যা চলছে তা যেন ঠিক মেনে নেওয়া যাচ্ছে না, বিশ্বায়নের পুঁজির সাথে বিশ্বায়নের যে পণ্যায়িত সংস্কৃতি আমাদের দেশেও ঢুকে পড়েছে তার জলজান্ত প্রমাণ পাড়ায় পাড়ায় এখন ডি. জে. (Disk Jockey) এ এক ভয়ংকর বিষয়। যাঁরা একটু

এরপর 4 পাতায়

## অরণ্য সম্পদ ধ্বংস

1 পাতার পর

এবং নদীগুলির নাব্যতা বাড়াতে হবে। জলপাইগুড়ি জেলার জয়ন্তী জঙ্গলের জয়ন্তী, ডিমা, বালা প্রভৃতি নদীগুলির রিভারবেড অনেক উঁচু হয়ে গেছে, ফলে বৃষ্টি হলেই জল বস্তি অঞ্চলে বন্যা ডেকে আনে।

৩) জলদাপাড়া, গরুমারা, চিলাপাতা, মেন্দাবাড়ী, নিমতি, জয়ন্তী, কালচিনি, চাপড়ামারি সহ প্রতিটি অঞ্চলেই জঙ্গলের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে ফলে পরিবেশে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, বৃষ্টিপাত কম হচ্ছে।

৪) উত্তরবঙ্গের তোর্ষা, তিস্তা, কালজানি, জলঢাকা, মুজনাই, মহানন্দা করতোয়া, আত্রেয়ী, পুনর্ভবা, মেচী, করলা সহ প্রায় প্রতিটি নদীই বর্ষাকালে নদীপথ পরিবর্তন করে জলপদে ঢুকে পড়ছে, ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

*বিপন্ন রসিক বিল ঃ (মোট আয়তন ১৭৮ হেক্টর)*

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের এবং কিছুটা অংশ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লক/রামপুর-বোচামারি অঞ্চলে খানিকটা প্রাকৃতিক ভাবেই রসিক বিল, পরবর্তীকালে বনদপ্তর রক্ষণাবেক্ষণ করা শুরু করে। জলাশয়টির আয়তন ক্রমশ কমে আসছে, গাছের সংখ্যা বিশেষতঃ ফল গাছের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, ময়ূর, সাপ, ঘরিয়াল, হরিণ প্রভৃতি বন্যপ্রাণীগুলি রক্ষণাবেক্ষণ অত্যন্ত নিম্নমানের। প্রতি বছরই শীতকালে পরিযায়ী ও অন্যান্য পাখীর আগমন কমে আসছে। পাখীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য ফল গাছ লাগানো প্রয়োজন এবং জলাশয়ের আয়তন ও গভীরতা বাড়াতে হবে। জলাশয়ে ফাইটো প্লাংকটন ও জু-প্লাংকটন এর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।

*বিপন্ন বাণেশ্বরের কচ্ছপ (মোহন) ঃ*

কোচবিহার ২ ব্লকের বানেশ্বর খোলটা, বোকালীর মঠ সহ বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েক হাজার কচ্ছপ দেখা যায়। কোচবিহার রাজ আমলেই শিবদিঘি সহ বেশ কয়েকটি দিঘি খনন করে কচ্ছপগুলি সংরক্ষণ করা হতো, উত্তর পূর্ব ভারতের বিস্তৃণ অঞ্চলের মানুষেরা এই কচ্ছপগুলিকে (চিটাগাংঙ্গ সফট টারটেল) "মোহন" নামে ডাকে। স্থানীয় এলাকার পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই কচ্ছপগুলিকে সংরক্ষণ করার জন্য পুকুরের পাড়গুলির জৈব বৈচিত্র্যে রক্ষণাবেক্ষণ ও মোহনদের খাবারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কোচবিহার জেলা দেবোত্তর ট্রাস্ট, জেলা প্রশাসন এই দায়িত্বে রয়েছেন। পুকুরের পাড় কোন ভাবেই পাকা করা যাবে না, যথেষ্ট ঘাস ও নরম থাকতে হবে। কিছুটা দূরে গাছ লাগানো দরকার।

*গাছ কাটা বন্ধে সরকারি আইন ঃ*

সুপ্রিম কোর্টের গ্রিন বেঞ্চের নির্দেশিকা থাকলেও গাছ কাটা নিয়ে সরকারী স্তরে আইন থাকা উচিত।

১৯৯৯ সালে পঃ বঃ সরকার-এ বন দপ্তর গাছ কাটা সংক্রান্ত একটি আইন এর খসড়া তৈরী করেন। এর নাম ওয়েস্টবেঙ্গল প্রোটেকশন অব ট্রিস-ইন নন ফরেস্ট এরিয়াস্ অ্যাক্ট। চূড়ান্ত খসড়ায় বলা হয়েছে শহরাঞ্চলে বন দপ্তরের অনুমতি ছাড়া একটিও গাছ কাটা যাবে না। এক্ষেত্রে গাছ কাটলে ১:৬ অনুপাতে বড় গাছ লাগাতে হবে। গাছের প্রয়োজনীয়তার কথা সর্বত্র বেশী করে বলতে হবে। বিশেষতঃ সরকারী অফিসে, স্কুলে, কলেজে ও রাস্তার ধারে (শাল, সেগুন, মেহগিনি, বট, অশ্বত্থ, অর্জুন, জারুল, নিম, চাপ সহ বিভিন্ন ফলের গাছ) গাছ লাগাতে হবে। প্রতিটি অঞ্চলে বন সুরক্ষা সমিতিগুলিকে আরও সক্রিয় হতে হবে। চোরা কারবারীদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ভাবে জনমত গড়ে তুলতে হবে।

প্রতি বছর ১৪ থেকে ২০ জুলাই ঘটা করে অরণ্য সপ্তাহ পালন করা হয়, গাছের চারা বিতরণ করা হয়। সরকারী ভাবে গাছ লাগানো হয়, কয়েক মাস পরে সেই জায়গায় আর দেখতে পাওয়া যায় না। গাছ লাগানোর জন্য পরিকল্পনা করেও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধুমাত্র ১ সপ্তাহ পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সারা বছরই গাছ লাগানোর জন্য নির্দিষ্ট পরিকাঠামো তৈরী করা দরকার।

*গাছ কাটার নামে রাস্তা চওড়া (একটি সমীক্ষার রিপোর্ট) ঃ*

দেশের সর্বত্র গাছ কাটার উৎসব চলছে। রাস্তা চওড়া করতে হবে অতএব গাছ খুন করো। ২০০৭ সালে কোচবিহার বিমান বন্দর চালু করার নাম করে ৩০০টি বৃহৎ আকারের গাছ (রাজ আমলের) স্থানীয় প্রশাসনের নির্দেশে রাতারাতি কেটে ফেলা হল। অনেক প্রতিবাদ করেও কাজ হয়নি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ১টি গাছের পরিবর্তে ৬টি গাছ লাগানোর চেষ্টা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে বিমান চালু হলে উন্নয়ন হবে। ২০১৩ এত মার্চ সাল অবধি বিমান পরিষেবা চালু হয়নি।

রাস্তা চওড়া করার জন্য উত্তর ২৪ পরগণার বারাকপুরের কাঁপা থেকে মন্ডোরী পর্যন্ত ৮ কিলোমিটার ২৪৮টি গাছ ২০০৪ সালে কাটা হয়, স্থানীয় বিজ্ঞান কর্মীরা সমীক্ষা করে জানিয়েছিল গাছগুলির নাম ও বিবরণ। মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েও কোন ফল পাওয়া যায়নি। গাছ কেটে ফেলা হয়।

| *উল্লেখযোগ্য গাছগুলির নাম* | *সংখ্যা* | *বিবরণ* |
|---|---|---|
| ১। আম গাছ | ২০টি | বড় মাপের গাছ |
| ২। বট গাছ | ১০টি | বড় মাপের গাছ |
| ৩। অশ্বত্থ গাছ | ৯টি | বড় মাপের গাছ |
| ৪। নিম গাছ | ১৩টি | বড় মাপের গাছ |
| ৫। মেহগিনি | ৬৫টি | ৪২টি বড়, ২৭টি মাঝারি |
| ৬। রাধাচূড়া | ১০টি | বড় মাপের গাছ |
| ৭। অর্জুন | ১৪টি | বড় মাপের গাছ |
| ৮। জারুল | ৫টি | বড় মাপের গাছ |
| ৯। কাঁঠাল | ৩টি | বড় মাপের গাছ |
| ১০। কদম | ৫টি | বড় মাপের গাছ |
| ১১। সিরিস | ৩৭টি | বড় মাপের গাছ |
| ১২। ছাতিম | ১১টি | ৯টি বড়, ২টি ছোট |
| ১৩। শিমূল | ৪টি | বড় মাপের গাছ |
| ১৪। খেঁজুর | ৬টি | বড় মাপের গাছ |

এরপর 3 পাতায়

## অরণ্য সম্পদ ধ্বংস

2 পাতার পর

| | | |
|---|---|---|
| ১৫। ঘোরানিম | ৪টি | বড় মাপের গাছ |
| ১৬। জিয়ল | ৩টি | বড় মাপের গাছ |
| ১৭। দেশীবাদাম | ১টি | বড় মাপের গাছ |
| ১৮। কালোজাম | ১টি | বড় মাপের গাছ |
| ১৯। সনাক্ত করা যায়নি এমন | ১৮টি | বড় মাপের গাছ |

পশ্চিমবঙ্গে বনভূমির পরিমাণ শতকরা মাত্রা ১৩.৪৬ ভাগ, এটা হওয়া উচিত ৩৩ ভাগ। মোট বনাঞ্চল রয়েছে মাত্র ১১,৮৭৯ বর্গ কিমি.।

জলপাইগুড়ি জেলার বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প এর আয়তন ৭৬১ বর্গ কিলোমিটার। ১৫২ প্রজাতির গাছ, ১৯২ প্রজাতির প্রাণী, ১৯৪ রকমের বন্য অর্কিড, ৭২টি ঔষধি অর্কিড, ৬২টি ঔষধি গাছ, ৪১ রকমের সরীসৃপ, ৪ রকমের উভচর, ৩৩ রকমের মাছ, ২৬৪ রকমের পাখী, বিভিন্ন স্তন্যপায়ী প্রাণী এবং চিতা বাঘ, হাতি ও রয়েল বেঙ্গল টাইগার। বন দপ্তরের বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় পাহাড়ী অঞ্চলের নদীর স্রোতে (রায়ডক সংকোশ, জয়ন্তী ডিমা, পোরো) ভেলা ভাসিয়া পাচার করা কাঠ চোরাই মিলে কাঠ চোরাইয়ের পর বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি হয়ে যায়। গড়ে দৈনিক ৫ লাখ টাকা মূল্যের কাঠ কালোবাজারে বিক্রি হয়ে যায়। কোর এরিয়ার বনকর্মীদের কাছে কাঠ পাচারকারীদের রুখে দেবার মতো কোন ব্যবস্থাই থাকে না, ফলে অবাধেই কাঠ নিয়ে চলে যায়।

*ঃ সর্বত্র বনাঞ্চল হ্রাস পাচ্ছে ঃ*

১) উত্তরবঙ্গের চাপড়ামারি ও নেওরাভ্যালি জাতীয় উদ্যান এবং সিকিমের প্যাংগোলাখা অভয়ারণ্য এর মধ্য দিয়ে চিন সীমান্ত পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর পরিকল্পনা করেছে ভারতীয় সেনা বাহিনী। জঙ্গলের কোর এলাকার ২০০ হেক্টর জমির অরণ্য নির্মূল হয়ে যাবে। জৈব বৈচিত্র ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। নানারকমের উদ্ভিদ (যথা শাল, ওক, ফার্ন, রডোডেন ড্রন প্রভৃতি) ও প্রাণী (রয়েলবেঙ্গল টাইগার, রেড পান্ডা, লেপার্ড, ব্ল্যাকরিয়ার, শ্লথ, লেসার ক্যাট, হিমলয়ান থর প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। বন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিকল্প রাস্তার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছে (ডামডিম-গোরু বাথান-লাভা- কোলবং-ছাগে-লিংমাখা-আড়িটার)।

২) সরকারী তথ্যে জানা যায় ২০০১ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত জঙ্গল লাগোয়া গ্রামগুলিতে হাতি তান্ডব চালিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫৮৬ জনকে মেরে ফেলে। অরণ্য নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে। এর কারণগুলি—

ক) বন সুরক্ষায় সরকারী ভাবে চরম উদাসীনতা। অরণ্য নিধন যাতে না হয় তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় না। হাতির চলাচলের রাস্তা বা মাইগ্রেশন রুট-এর পথ বাধা সৃষ্টি করা চলবে না। জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক বা 'ন্যাচারাল সল্ট ওয়াটার বডি' বা প্রাকৃতিক নুন চাটার জলা জায়গা এর রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে।

খ) জঙ্গলের মধ্যে রেল লাইন প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে, অথচ বন দপ্তর বা রেল দপ্তর কোন রকম কাটা তারের বেড়া বা করিডর ছাড়াই রেল চলাচলের ছাড়পত্র দেন। এর ফলে রেল লাইনে হাতি, বাইসন সহ বহু বন্যপ্রাণী মারা যায়। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়ি সেভক-মাদারিহাট-হাসিমারা-রাজা ভাত খাওয়া-আলিপুরদুয়ার জংশন রেল লাইনে বন্য প্রাণী মারা যাওয়ার ঘটা প্রায়ই ঘটে থাকে।

৩) ফরেস্ট সার্ভে অব ইন্ডিয়ার রিপোর্টে জানা যায় ঝাড়খন্ডের হাজারিবাগ, কোডারমা, লোহারডাগা, চাতরা, পাকুর, পলামুর মতো ঘন জঙ্গল এলাকাগুলির বনাঞ্চল সংকুচিত হচ্ছে। পলামুতে ২৯৯ বর্গকিমি, চাতরা জেলায় ১০৭ বর্গকিমি, কোডারমায় ৯ বর্গ কিমি সহ সর্বত্র জঙ্গল এলাকা কমে গিয়েছে।

বন দপ্তর জানিয়েছেন শিল্প স্থাপনের জন্য নির্বিচারে গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে, চোরাকারবারীদের দৌরাত্ম বেড়ে চলেছে।

৪) সিকিম-ভুটান-হিমালয় থেকে সৃষ্ট তিস্তা, তোর্সা, মহানন্দা, জলঢাকা, রায়ডাক, সংকোশ অসংখ্য পাহাড়ি নদীগুলি বিগত তিন যুগ ধরে প্রায় শুকিয়ে গিয়েছে। বাস্তবিক ভাবে পাহাড়গুলিকে ক্রমশ: ন্যাড়া করে দেওয়া হচ্ছে, ফলে ধ্বস নামছে। শাল, ওক, পাইন, দেবদারু সহ বিভিন্ন পাহাড়ি গাছগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য পরিকল্পনা করা দরকার। গাছের সংখ্যা যত বাড়বে বৃষ্টিপাত বাড়বে, ভূমিক্ষয় হ্রাস পাবে, পাহাড়ে বর্ষাকালে ধ্বসের সংখ্যাও কমে আসবে।

৫) পরিবেশ বিদদের সমীক্ষায় জানা যায় অরণ্য সংরক্ষণ আইন (১৯৮০) শিথিল করে ভারতবর্ষের বহু জায়গায় পরিবেশগত কারণে আটকে থাকা প্রকল্পকে ছাড়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে কয়েক লক্ষ হেক্টর বনভূমি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এলাকাভিত্তিক বহু প্রজাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। জলাভূমির ক্ষতি হবে। জল, বাতাস ও সামগ্রিক পরিবেশ দূষিত হয়ে পড়বে, পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়তে থাকবে।

নির্বাচনী ইস্তাহারে কোন রাজনৈতিক দল পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলিকে (যথা জলসংরক্ষণ, অরণ্য সংরক্ষণ, জৈব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও বিশ্ব উষ্ণায়ন প্রভৃতি) আমল দেন না, ফলে পরিবেশ বিষয়টি বরাবরই অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

*পরিবেশ বিপন্ন : সমাধান কোন পথে?*

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে পরিবেশ বিপন্ন হচ্ছে। ১৯৭২সালের পর বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ও চুক্তির মেয়াদ শেষ হবার মুখে। গ্রিন হাউস গ্যাস সহ পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তন সবচেয়ে ভয়াবহ সমস্যা। সমস্যা সমাধানের কয়েকটি দিক —

১) অরণ্যসৃজন বাড়াতে হবে ও জলাভূমির সঠিক সংরক্ষণ / বিজ্ঞানীদের মতে নিম, তুলাগাছ, শাল, বট, অশ্বত্থ, অর্জুন, মেহগিনি, ক্যাকটাস, সাইট্রাস ও ফলের গাছ প্রভৃতি গাছ বেশি পরিমাণে নদী, জলাশয়ের পাড়ে রাস্তার ধারে পতিত অঞ্চলে ও শহর গুলির রাস্তার ধারে লাগাতে হবে কারণ এই ধরণের গাছগুলি বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম।

২) জঙ্গলের কোর এরিয়ার গাছের ঘনত্ব ও খাদ্য খাদক সম্পর্ক

এরপর 4 পাতায়

## 'মূল্যবোধের নাট্যমেলা'

১ পাতার পর

দূর্বল হৃদয়ের মানুষ তাদের কাছে তো বটেই সাধারণ রুচিশীল মানুষের কাছেও এটা অত্যন্ত বিরক্তিকর। শব্দ দূষণ নিয়ে একটা আইন আছে কিন্তু প্রচন্ড বড় একটা বক্সের মধ্য দিয়ে ডিপ-ডিপ করে বাড়তে থাকা ও তার সাথে কিছু মেকানিক্যাল সাউন্ড বাজতে থাকে তখন জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়। এর বিরুদ্ধে শব্দদূষণের আইন আছে কিনা জানা নেই কিন্তু বিকল্প তো কিছু একটা চাই। বালক বাবার মৃত্যুর পরই বিকল্প লোকনাথবাবার আবির্ভাব। আসলে পশ্চিমবঙ্গের কিছু মানুষ যেমন বাবা ছাড়া থাকতে পারেন না তেমনি সংস্কৃতিপ্রেমী বাঙালির কিছু একটা গান বাজনা চাই।

গ্রামে কাজ করতে গিয়ে লক্ষ্য করেছি যে মানুষ একবার পরিশোধিত পানীয় জল খাওয়া শুরু করেছেন তিনি কিছুতেই আর দূষিত জল পান করতে আগ্রহী নন। মূল বিষয় সুস্থ সংস্কৃতির স্বাদ একবার পাইয়ে দেওয়া তারপর দেখা যাক কী হয় ? এবার নাট্যমেলা দ্বিতীয় বছর। সরকারি সাহায্যের মুখাপেক্ষী নয় এই নাট্যমেলা। বড় কর্পোরেট বিজ্ঞাপনও তারা নেবেন না। টিকিট করে নাটক বা সংস্কৃতি কেনাবেচা থেকে তারও বিরোধী এই দুই সংগঠন। তবে প্রায় ৪০ হাজার টাকা লাগবে এই ৩দিনের নাট্যমেলায়। যাঁদের হাঁটুতে ব্যথা তাঁরা চেয়ারে বসবেন আর যাদের হাঁটুতে ব্যথা নেই তাঁরা ফরাসে মানে চটে। বুক দুরু দুরু করে কার্ড হাতে পাড়ায় পাড়ায় দোকানে দোকানে। কত টাকা দিতে হবে ? আপনার যা ইচ্ছে দিন। প্রবেশ অবাধ বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসুন নাটক দেখতে। তোরা একটু বেশি বিনয় করিস এখন ১০ টাকায় কিছু হয় ২০ টাকা রাখ। উঠেগেল ৪০ হাজার টাকা। যারা মূল দায়িত্বে, চোখে জল এসে গেল তাদের। কি ভুল ধারণা ছিল। বেশির ভাগ মানুষই তো সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে। শুরু হল নাট্যমেলা। যাঁরা ম্যারাপ বাধলেন বা মাইক ও ইলেকট্রিকের কাজ করলেন তাঁদের আচার ব্যবহার যেন সংস্থার বন্ধুদের মত। যিনি বাথরুম পরিষ্কার করলেন নাম মনু বলছিল আমি মাঠ ঝাঁট দেব পয়সা নেব না, কিন্তু সব নাটক দেখব বাড়ির সবাইকে নিয়ে।

২৫ জানুয়ারি, ২০১৩ বিকেল ৪টেয় সাপ ও সাপের কামড়ের চিকিৎসা সংক্রান্ত আলোচনা। সংচালক চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার বন্ধুরা। আলোচনা সভায় আলোচকগণ বললেন দর্শক আর সাপের কামড়ে আক্রান্ত রোগীগন জীবনের কথা বেশি করে বললেন। প্রাণবন্ত হয়ে উঠল অনুষ্ঠান। সাপের কামড়ের পর মানুষ ওঝার কাছে যান এটাই কঠিন বাস্তব কিন্তু সাপের কামড়ের একমাত্র প্রতিষেধক এ.ভি.এস.। মানুষের শরীরে কীভাবে মন্ত্রের মত কাজ করে তা যখন এই সংগঠনের কণিষ্ঠ কর্মী সংস্কৃতি বলছিল সবাই হতবাক। অনুষ্ঠান ৪টেয় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ১৩ মিনিট দেরীতে শুরু হওয়ায় উদ্যোক্তারা ক্ষমা চেয়ে নেন।

পরবর্তী অনুষ্ঠানে অগ্নিবীণার সুমেলি চক্রবর্তীর গান অসাধারণ। আর আবহমানের 'বুনো' নাটক শেষে একটু বিরতির পর পথসেনার বিখ্যাত নাটক মহাশ্বেতা দেবীর 'বেহুলা' অনুষ্ঠিত হয়। নাটক শেষ হওয়ার পরও বসেছিলেন দর্শকগণ এই আবেশ থেকে তারা যেন বের হতে পারছিলেন না।

২৬ জানুয়ারী ঠিক ৫টায় অনুষ্ঠানে শুরু হল গান দিয়ে। সুতপা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গান দিয়ে। রাজেশ দত্তর লেখা অসাধারণ শব্দচরণ যুক্ত গান আর সুতপাদির উদাত্ত কণ্ঠ সব মিলিয়ে অনুষ্ঠান জমে উঠল। নাটক-গোবরডাঙ্গার শিল্পাঞ্জলির 'বেগুন পুরান' কলকাতা প্রস্থানের ''হট্টমলোর ওপারে'। শেষ নাটক চেনা আধুলির 'ভুলরাস্তা' দিয়ে ২৬ জানুয়ারী অনুষ্ঠান শেষ হয়।

২৭ জানুয়ারী সকালবেলা থেকে '' চোখ সুস্থ রাখুন আর সুস্থ চোখে সুস্থ সংস্কৃতি দেখুন''। প্রায় ১০০ মানুষ চোখ দেখালেন। ১০ জন মানুষের চোখের ধারাবাহিক চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হল।

অতনু মজুমদারের গান দিয়ে শুরু হল শেষ দিনের অনুষ্ঠান। আই.পি.টি আর গণবিষানের পুরাতন গান ভরে গেলে মানুষের মন।

আয়নার 'সিংহমুখ' নাটকের মধ্য দিয়ে পিরামিড ভেঙে যাওয়ার ভয় থেকে মানুষ বেরোতে চেষ্টা করলেও সে আক্রান্ত হচ্ছে। তবুও নিরন্তর এ লড়াই চলবে।

শেষে শতাব্দীর 'মিছিল' নাটকের শেষে কুশীলবগন মিছিলে নেই, দর্শকগণ মিছিলকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে যা শুধু মানুষের কোনো গোষ্ঠীর নয়।

চাকদহ সহ নদীয়ার মানুষ আপ্লুত অবক্ষয় ও চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থার ছেলেরা ও মেয়েরা ভাবছে শহর ছেড়ে গ্রামে গ্রামে এই বার্তা কি করে পৌঁছানো যায়।

*— প্রতিবেদক ঃ বির্বতন ভট্টাচার্য, বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মী চাকদহ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক সংস্থা, ফোন ঃ ৯৩৩২২৮৩৩৫৬*

---

## অরণ্য সম্পদ ধ্বংস

3 পাতার পর

বজায় রাখতে হবে। প্রতিটি জঙ্গলের বিভিন্ন প্রাণীর সংখ্যা (আনুমানিক) জানার জন্য জনগণনা (বাঘ, হাতি, গন্ডার, বাইসন, পাখী ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণী) করা দরকার। এর ভিত্তিতে জঙ্গলের বিভিন্ন ফলের গাছ, জলাশয় সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রজনন প্রক্রিয়া যাতে কোন ভাবেই ব্যাহত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

৩) প্রতিটি শিল্প কল-কারখানায় দূষণ প্রতিরোধক প্রযুক্তি সঠিক ভাবে কার্যকরী করতে হবে। যে সব শিল্পের দূষণ প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেই (যেমন পরমাণু বিদ্যুৎ/চুল্লি শিল্প), সেগুলিকে কোন ভাবেই পরিবেশে ছাড়পত্র দেওয়া চলবে না। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে ইলেকট্রো স্ট্যাটিক্ প্রেসিপিটেটর্ (ই.এম.পি), মেকানিক্যাল ডাস্ট কালেক্টর ও শীতলী কারক ব্যবস্থাগুলি পুরোপুরি কার্যকর রাখতে হবে।

*— জয়দেব দে, ফোন ঃ ৯৪৭৪৩৩০০৯২*

## জাতীয় প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবস

1 পাতার পর

ব্যবসা বন্ধের লক্ষ্যে বহু আলোচনা হল। জেনেভার সেই বৈঠকে নীতি প্রণয়নের জন্য একটি রূপরেখা রচিত হল। নৈতিক মানদন্ড হিসেবে প্রত্যঙ্গ দান বা গ্রহণে আর্থিক লেনদেনের বিরোধিতা করা হয়। মৃত দাতার থেকে প্রত্যঙ্গ গ্রহণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। পাশাপাশি বলা হয় জীবন্ত দাতার ক্ষেত্রে গ্রহীতার নিকট আত্মীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়। এই নির্দেশিকাকে সম্বল করেই পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আইন প্রণীত হয়।

পৃথিবীতে মানবকল্যাণ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির লক্ষ্যে প্রথম মরণোত্তর দেহদান সংঘটিত হয় ১৮৩২ সালে। দাতা চিন্তাবিদ জেরেমে বেন্থাম। বিশ্বে প্রথম মানবদেহে প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন হয় ১৯৫৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিডনি প্রতিস্থাপিত হল। দাতা ও গ্রহীতা যমজ ভাই। ১৯৫৯ সালে ফ্রান্সের লিয়নে একদল স্নায়ুশল্যবিদ মস্তিষ্ককান্ডের মৃত্যুকে ব্যাখ্যা ও চিহ্নিত করেন। মৃত্যু বলতে সাধারণভাবে বোঝায় হৃৎপিন্ডের শেষবারের মতো স্তব্ধ হয়ে যাওয়া এবং শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে থেমে যাওয়া। কিন্তু মস্তিষ্কের মৃত্যুর পরেও যন্ত্রের মাধ্যমে হৃৎপিন্ডকে চালু রেখে প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন করলে মরণাপন্ন রোগীর জীবনদান করা সম্ভবপর। আশির দশক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মরণোত্তর দেহ থেকে প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন শুরু হয়।

মরণোত্তর দেহ থেকে প্রত্যঙ্গও কলা প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই নৈতিকতার প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। বিশেষত জীবন্ত দেহ থেকে প্রত্যঙ্গ গ্রহণকে কেন্দ্র করে অনৈতিক ব্যবসা বন্ধে সক্রিয় হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৯৯১ সালে আন্তর্জাতিক হেলথ অ্যাসেম্বলি নীতি নির্ধারণে এক প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। এই নীতিতে স্বেচ্ছাদানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। রাষ্ট্রসংঘ গাইডিং প্রিন্সিপিল্‌স অন ইনটারনাল ডিসপ্লেসমেট সনদে মৃত মানুষের প্রতি আরো বেশি মনোযোগ ও যত্ন নেওয়ার কথা বলেছে।

নৈতিক মানদন্ড নির্ণয়ের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ারই উদাহরণ এই আন্তর্জাতিক প্রত্যঙ্গ প্রদান দিবস পালন। ২০১০ সাল ভারতের প্রত্যঙ্গ ও কলা প্রতিস্থাপনের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য বছর। ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে ২০১০ সালের ২৭-২৮ নভেম্বর বিজ্ঞান ভবনে অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক প্রত্যঙ্গ ও কলা দান কংগ্রেস যেখানে ২৮ নভেম্বর প্রতি বছর প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবসের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৯৫৬ সালে মানবকল্যাণ ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির লক্ষ্যে ভারতে প্রথম মরণোত্তর দেহদান করেন মহারাষ্ট্রের পান্ডুরঙ্গ শ্রীধর আপ্তে। তাঁর দেহ গ্রহণ করে পুনের বি জে মেডিক্যাল কলেজ। ১৯৬৪ সালের ১ ডিসেম্বরবিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী জে বি এস হলডেনের মরণোত্তর দেহ অন্ধ্রপ্রদেশের রঙ্গরাইয়া মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী এই বিজ্ঞানীর ৯৫ তম জন্মদিবসে গণদর্পণ শুরু করল নতুন এক আন্দোলন। মরণোত্তর দেহদান আন্দোলন। ১৯৮৫ সালে বিজ্ঞানমানসিকতা ও যুক্তিবাদ প্রসারের লক্ষ্যে গণদর্পণ-এর পাঁচজন সদস্য সাম্প্রদায়িক চেতনা ও ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে নতুন জেহাদ ঘোষণা করলেন। মৃত্যুর পর সাম্প্রদায়িক মতে অন্ত্যেষ্টি নয়। সত্যিকারের অসাম্প্রদায়িক ও বিজ্ঞানমনস্ক হতে মৃত্যুর পর তাঁদের দেহ দানের সিদ্ধান্ত নিলেন। যেহেতু তাঁরা ব্যক্তি সম্পত্তিতে বিশ্বাস করতেন না, তাই মৃত্যুর পর দেহ'র অধিকার সমাজের বলেই তাঁরা মনে করলেন। ১৯৮৬ সালের ৫ নভেম্বর হলডেনের জন্মদিবসে ৩৪ জন মরণোত্তর দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেন।মরণোত্তর দেহদানের জন্য ভারতে তখন সংগঠন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু বিজ্ঞানমানসিকতা গড়ার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এই সামাজিক আন্দোলনের প্রথম সংগঠন গণদর্পণ। উনবিংশ শতকের নবজাগরণের আলোয় উদ্ভাসিত এই বাংলায় বিজ্ঞানমানসিকতা ও যুক্তিবোধের চর্চা বিস্তার লাভ করে। ১৯৮৫ সালে সেই আন্দোলনে সংযোজিত হল নতুন এক অধ্যায়।

প্রারম্ভিক পর্বে দেশে প্রত্যঙ্গ ও কলা প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কোন আইন ছিল না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ভারতীয় সংবিধানের ২১নং ধারা অনুসারে জীবনের অধিকার মৌলিক হিসেবে স্বীকৃত, যার যথার্থ বাস্তবায়নে মানব-মৃতদেহের অধিকার রাষ্ট্রের হাতে অপর্ণ করা প্রয়োজন। সংবিধানের ৫১ (এ) এইচ ধারা অনুসারে বিজ্ঞানমানসিকতার প্রসার ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য। মেডিক্যাল ছাত্র-ছাত্রীদের অ্যানাটমি বা শারীরস্থান বিজ্ঞান প্রশিক্ষণের কাজেই দান করা দেহ ব্যবহৃত হত। প্রত্যক্ষ ও কলা প্রতিস্থাপনের জন্য প্রয়োজন মস্তিষ্ককান্ডের মৃত্যুর আইনি স্বীকৃতি। উদ্যোগী হল গণদর্পণ। প্রস্তুত করল খসড়া বিল। ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হাতে গণদর্পণ সেই বিল তুলে দিল। এর পরের মাসে এই সংক্রান্ত আইন রচনার কথা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করে।

১৯৮৮ সালের ৬ জুন ভারতবর্ষে শল্যচিকিৎসা এবং মরণোত্তর দেহদানের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য দিন। নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের মেয়ে বন্দনা মোদকের দেহে প্রতিস্থাপিত হল তার বাবা দীনেন্দ্র চন্দ্রের মৃতদেহ থেকে সংগৃহীত কিডনি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বন্দনা মোদক এখনও সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনে সক্ষম। ১৯৯০ সালের ১৮ জানুয়ারি রাজ্যে প্রথম মরণোত্তর দেহদান হল। সুকুমার হোম চৌধুরীর মরণোত্তর দেহ কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে দান করা হয়।

১৯৯৪ সালে সংসদে গৃহীত হল মানব প্রতঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪। অবশেষে ১৯৯৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আইনটি বিধিবদ্ধ হয়। আইন রচনায় গণদর্পণ-এর তৈরী করা খসড়া বিলটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পশ্চিমবঙ্গে ওই বছরেই ১১ আগষ্ট আইন চালু হয়। মস্তিষ্ক মৃত্যু পেল আইনি স্বীকৃতি। প্রথমে কলকাতার এস এস কে এম হাসপাতালকে এই আইন অনুযায়ী প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া হয়। আন্দোলন এগোলো এক ধাপ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাপানে এই সংক্রান্ত আইন চালু হয় ১৯৯৭ সালে। ২০০৫ সালে প্রথম

এরপর 6 পাতায়

## জাতীয় প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবস

5 পাতার পর

আন্তর্জাতিক প্রত্যঙ্গ দান দিবসে বিভিন্ন দেশে বিধি প্রণয়নের বিষয়টি আলোচিত হয়। সেই বিচারে ভারত অনেকটাই এগিয়ে।

আইন প্রণীত হলেও বাস্তবায়নে রয়েছে নানা প্রতিবন্ধকতা। শুরু হল আন্দোলনের নতুন অধ্যায়। রয়েছে নানা ধর্মীয় কুসংস্কার, আমলাতান্ত্রিক উন্নাসিকতা, কায়েমি স্বার্থের মানসিকতা অন্যতম প্রতিবন্ধক। সর্বোপরি প্রত্যঙ্গ নিয়ে ব্যবসা করা দুষ্ট চক্র হীন ব্যবসায়িক স্বার্থে সদা সক্রিয়। এদের বিরুদ্ধেই তো প্রত্যঙ্গ ও কলা দান দিবসের আয়োজন।

আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে শবব্যবচ্ছেদ অতি গুরুত্বপূর্ণ, অথচ ভারতে দীর্ঘযুগ ধরে বিষয়টি গুরুত্ব পায়নি। গণদর্পণ জনস্বার্থের মামলা দায়ের করল। তার প্রেক্ষিতে ২০০০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা হাইকোর্ট এম সি আই সহ সমস্ত চিকিৎসাবিদ্যা পড়ানোর সংস্থাগুলোকে ময়নাতদন্ত আবশ্যিক করার নির্দেশ দেয়। ২০০১ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিক্যাল কলেজে দান করা মরদেহ গ্রহণ ও তার বৈজ্ঞানিক ব্যহারের জন্য নির্দেশিকা জারি হয়। এর পূর্বে ১৯৯৯ সালে মৃত্যুর ঘোষণাপত্র মৃত্যুর একঘন্টা পরেই দেওয়ার নির্দেশিকা জারি হয় — যে নির্দেশিকা প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপনের সুযোগকে ত্বরান্বিত করে। এসবই দেহ দান আন্দোলনের সাফল্য।

পশ্চিমবঙ্গ মরণোত্তর দেহ দান আন্দোলনে অন্যতম পথিকৃৎ। আইন চালু হওয়ার পর ভারতের বহু রাজ্যে মরণোত্তর দেহ থেকে সংগৃহীত প্রত্যঙ্গ ও কলা প্রতিস্থাপনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু হয়। কিন্তু এ রাজ্য পিছিয়ে পড়ল। গণদর্পণ প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি প্রশাসনকে উদ্যোগী করতেও নানা কর্মসূচী গ্রহণ করে। ২০০৪ সালে জে বি এস হলডেনের জন্মদিনে বিশ্বের প্রথম মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপনের ৫০ তম বর্ষে প্রত্যঙ্গ ও কলা প্রতিস্থাপন সমন্বয় কেন্দ্র নামে প্রকল্পের সূচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহায়তায় এই প্রকল্পের যৌথ উদ্যোক্তা গণদর্পণ এবং সুশ্রুত আই ফাউন্ডেশন অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারে।

২০০৯ সালের ২৪ এপ্রিল এস এস কে এম হাসপাতালেই বাবার দেহ থেকে সাত মাসের শিশুর দেহে লিভার প্রতিস্থাপনে সাফল্য এল। কিন্তু এক্ষেত্রে দাতা জীবিত। দীবিত দাতার ক্ষেত্রে জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। এই ঘটনার পর শৈথিল্য কাটিয়ে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হল। মস্তিষ্ককান্ডের মৃত্যু ঘোষণার জন্য চালু হল সরকারি নির্দেশনামা। ২০১০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি এস এস কে এম হাসপাতালে মস্তিষ্ককান্ডের মৃত্যু হওয়া জয়দেব পালের দেহ থেকে সংগ্রহ করা লিভার প্রতিস্থাপিত হয় জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায়-এর দেহে। স্বীকৃত হল মস্তিষ্ক কান্ডের মৃত্যু ঘোষণার অধিকার। মৃত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গও মস্তিষ্ক কান্ডের মৃত্যুকে স্বীকৃতি দিয়ে রাজ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করলেন। আন্দোলন কয়েক কদম এগোলো। ২০০৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার মানব প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন, ১৯৯৪ কে সংশোধনের জন্য সংসদে বিল আনে।

দীর্ঘ সাতাশ বছর পর এল বহু প্রতীক্ষিত দিন। আইন চালু হওয়ার পর পূর্বভারতে প্রথম সফল মরণোত্তর দেহ থেকে প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপিত হল। ২০১২ সালের ১৭-১৮ ফেব্রুয়ারি বেলভিউ নার্সিংহোমে নদিয়ার বিমল কর্মকারের মস্তিষ্ককান্ডের মৃত্যু ঘটে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের সম্মতিক্রমে এস এস কে এম হাসপাতালে দুই যুবকের দেহে তাঁর দুটি কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়। একবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বেআইনি কিডনি বাজার হিসেবে কুখ্যাত কলকাতাই পারল পূর্ব ভারতকে পথ দেখাতে।

পশ্চিমবঙ্গে আজ দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ মরণোতত্র চক্ষুদান/ দেহদানের অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। মরণোত্তর দেহদান সংঘটিত হয়েছে ১৭০০-র বেশি। কিন্তু পূর্ব এবং উত্তর-পূর্ব ভারত এ ব্যাপারে সমগ্র দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে। আসাম, ত্রিপুরা, মেঘালয় ব্যতীত এই অঞ্চলের কোন রাজ্যেই মরণোত্তর দেহদান করা হয়নি।

*— তৃতীয় জাতীয় পতঙ্গ কলা দান দিবস পালনের প্রস্তুতিতে গণদর্পণের সাধারণ সম্পাদক ব্রজ রায়ের স্বাগত ভাষণের নির্বাচিত অংশ।*

## রাসায়নিক অস্ত্র

1 পাতার পর

বাইরে এই কাঠের স্তূপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করছিল যাতে এথেন্সবাসীরা এর তীব্র ঝাঁঝালো ধোঁয়াতে কাশি এবং শ্বাস কষ্টে আক্রান্ত হয়ে তাদের ঘরদোর অসংরক্ষিত রেখে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকে এই অতীত পৃথিবীর বিভিন্ন সংঘর্ষে অস্ত্র হিসেবে গরম জল, গরম তেল প্রভৃতি ব্যবহৃত হলেও গ্যাসের ব্যবহার খুব বেশী একটা হয়নি। তবে পরবর্তী প্রায় দু হাজার চারশ বছর অস্ত্র হিসেবে বিভিন্ন রাসায়নিকের ব্যবহার ইউরোপের দেশগুলিতে একরকম আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে ১৮৯৯ সালে জার্মানির হেগ শহরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কনভেনশনে রাসায়নিক ভিত্তিতে তৈরী সকল যুদ্ধাস্ত্রকেই নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সমরাস্ত্র তৈরীর গবেষণায় নিত্যনতুন রাসায়নিক ব্যবহার একরকম অনিবার্য ছিল। ১৯১০ সালে ইউরোপে মিলিটারী রসায়নবিদরা তাদের আভ্যন্তরীন প্রতি রক্ষার স্বার্থে ব্রোমিন সমৃদ্ধ ল্যাক্রিমোটর (চোখের জল নির্গমনকারী পদার্থ যেমন কাঁদুনে গ্যাস) তৈরী করেন যা অত্যন্ত সক্রিয় এবং মানবদেহে ক্ষত সৃষ্টিকারী একটি পদার্থ। এর ঠিক দু'বছর পর ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী সরকার তার দেশে একদল ব্যাঙ্ক ডাকাতের উপর আরো সক্রিয় ইথাইল ব্রোমো অ্যাসিটেট সমৃদ্ধ ল্যাক্রিমোটোর প্রয়োগ করে। আর এর মধ্যেই ১৯১৪ এর অগাষ্ট মাসে শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধে প্রথম রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে ফ্রান্স ও জার্মানি উভয়ের সেনাবহিনীর উপর। যেখানে ফ্রান্স ব্রোমিন সমৃদ্ধ সেল ব্যবহার করেছিল, আর জার্মানির ব্যবহৃত সমরাস্ত্র থেকে নির্গত হয় বিষাক্ত কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস। ঠিক এই সময়কালে ইউরোপের ইতিহাসে গ্যাসীয় গবেষণায় যিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন তিনি হলেন ইহুদি বংশজাত জার্মান রসায়নবিদ ফ্রিৎজ হেবার (Fritz Haber) ১৯০০ খ্রীষ্ট্রাব্দে তিনি সরাসরি নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটিয়ে অ্যামোনিয়া উৎপাদনের পদ্ধতি আবিষ্কার

এরপর 7 পাতায়

## রাসায়নিক অস্ত্র

6 পাতার পর

করেন যা পরবর্তীকালে ইউরিয়া প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু এই মেধাবী বিজ্ঞানীকে ইতিহাস শ্রদ্ধার সাথে মনে রাখে নি। কারণ রসায়নবিদ্যার গবেষণায় অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করেছেন যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের উপযোগী মারাত্মক সব গ্যাসীয় বিষ আবিষ্কারে। এমনকি অনেক বিজ্ঞান ঐতিহাসিক তো মনে করেন অ্যামোনিয়া সৃষ্টির উপজাত হিসেবে সেই সময় তিনি জার্মানিকে বিভিন্ন প্রকার নাইট্রোজেন ঘটিত বিস্ফোরক তৈরীকে সহায়তা করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান সেনাবাহিনীর তরফে তিনি গ্যাসীয় মারণাস্ত্র তৈরীর কাজে নিযুক্ত হন। শ্রীঘ্রই হেবারের এই কর্মস্থল 'The Haber Office' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। এই কাজে তার পরিবারের সদস্যরা কিন্তু খুব খুশি ছিলেন না, বিশেষতঃ তার স্ত্রী ক্লারা। তিনিও বিজ্ঞানের মেধাবী ছাত্রী হিসেবে হেবারের নিজের শহর ব্রাসলোর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মহিলা হিসেবে প্রথম পি. এইচ. ডি. ডিগ্রীর অধিকারী ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দ্বিতীয় মেরী কুরি হয়ে ওঠার সমস্ত রসদ ক্লারার মধ্যে থাকলেও হেবারের সংকীর্ণ মানসিকতায় তা আর হয়ে ওঠেনি। তাই এই বিদুষী মহিলা হেবারের পরিবারে কখনোই পর্দার বাইরে আসতে পারেননি।

রাসায়নিক মারনাস্ত্র তৈরীর নেশায় উন্মত্ত হেবার তখন দিনরাত রসায়নাগারে গবেষণা করে চলেছেন। সেই সময় জার্মান সেনাবাহিনী তার তৈরী রাসায়নিক মারনাস্ত্রের প্রথম সফল প্রয়োগ ঘটায় ইপ্রেস শহরের কাছে প্রায় ৫ হাজার ফরাসীর উপর। হেবার হিসেব করতে বসলেও মারণ গ্যাসের গাঢ়ত্ব, মৃত্যুর সময় এবং মৃতের সংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন রকম সম্পর্ক। তার এই ভয়ানক গ্যাস প্রজেক্ট নিয়ে তখন স্ত্রী ক্লারার মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত। এই সময়ে ইপ্রেসে গ্যাস মারনাস্ত্র ব্যবহারের সাফল্য উদযাপনে হেবার নিজের বাড়ীতে এক বিরাট পার্টির আয়োজন করেন। এদিকে স্বামীর সাথে ক্লারার বিরোধ তখন চরমে। সেই রাতেই ক্লারা তাদের বাগানে হেবারের সৈনিক পিস্তল দিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্বামীর গ্যাস প্রজেক্টের বিরুদ্ধে এভাবেই ক্লারা তার চূড়ান্ত প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এতেও হেবারকে নিরস্ত্র করা যায়নি। স্ত্রী অন্তিম যাত্রায় সঙ্গী না হয়ে পরদিন ভোরে তিনি বরং ফিরে গিয়েছিলেন তার নিজস্ব কর্মস্থলে। ইতিহাস তাই আজও হেবারকে মনে রেখেছে মানবতা বিরোধী এক দুর্বিনীত বিজ্ঞানী হিসেবে। এমনকি ১৯১৮ সালে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য তিনি রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হওয়ার ঠিক পরের বছরই তাকে রাসায়নিক মারনাস্ত্রের সমর্থক হিসেবে আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধীর তকমা দেওয়া হয়। উত্তরসুরী রসায়বিদদের কাছেও তিনি নিন্দিত হন তার অমানবিক কর্মকান্ডের জন্য। এ প্রসঙ্গে ২০০১ সালে বিখ্যাত ভারতীয় রসায়নবিদ অধ্যাপক সি.এন. আর রাও শিলিগুড়িতে স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক বক্তৃতায় হেবারকে উল্লেখ করে বলেন —"একজন ভালো বিজ্ঞানী হওয়ার চেয়েও অনেক জরুরী প্রথমে একজন ভালো মানুষ হওয়া।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে একাধিক আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী যখন জার্মানিকে বিপুল পরিমান ঋণের বোঝা বইতে বাধ্য করা হয় তখন দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে হেবার তার জীবনের প্রায় ছয়টি বছর ব্যয় করেন সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত সোনা সংগ্রহের চেষ্টায়। যদিও তার সেই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছিল। এই সময়ের গবেষণায় তার সাফল্য বলতে কেবলমাত্র একটি পোকামাকড় ধ্বংসকারী রাসায়নিক জাইক্লন-এ (Zyklon A) আবিষ্কার। কিন্তু এই দেশপ্রেমী হেবারকেই পরবর্তীকালে তার দেশ থেকে বিতারিত হতে হয় ইহুদি হওয়ার অপরাধে। অবশেষে ১৯৩৪ সালে শরণার্থী হিসেবে ইংল্যান্ডে যাওয়ার পথে জাহাজে তার মৃত্যু হয়। এর কয়েক বছর পরই নাৎসীরা শুরু করে ইহুদি নিধন যজ্ঞ। গ্যাস চেম্বারে নিহত হন কয়েক লক্ষ ইহুদি নরনারী, যাদের মধ্যে হেবারের অনেক নিকট আত্মীয় স্বজনও ছিলেন। মারণ গ্যাস হিসেবে সেখানে যে জাইক্লন বি ব্যবহৃত হত সেটা ছিল হেবার আবিষ্কৃত জাইক্লন এর পরিমার্জিত রূপ (Second Generation of Zyklon A)। এইভাবে বিজ্ঞানী হেবার মারণ গ্যাস তৈরীর নেশার সাথে জড়িয়ে আছে নিজের পরিবারেরও অদৃষ্ট।

২০১১ সালকে ইউনেস্কো আন্তর্জাতিক রসায়নবিদ্যা বর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও রয়েল সোসাইটি অফ কেমিস্ট্রির উদ্যোগে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত হয় একাধিক আলোচনা সভা ও সেমিনার। এইভাবে যখন আলোচিত হয় রসায়নের সাফল্য এবং মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে তার মূল্যবান অবদান সমুহ তখন ইতিহাসের কিছু ঘটনা এই রসায়নের অপব্যবহার সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দেয়। আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই যাতে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এই রসায়ন শস্ত্রের প্রয়োগ কেবলমাত্র সভ্যতার কল্যাণেই হয়ে থাকে এবং বিজ্ঞানীরা যেন পথভ্রষ্ট না হন।

*লেখকঃ ড. অমিতাভ চক্রবর্তী, শ্রী রামকৃষ্ণ বয়েজ হাইস্কুল (উঃমাঃ) কোচবিহার, Ph.: 9434377067, E.mail : acnbu@rediffmail.com*

## সংবাদ

যৌথ বিজ্ঞান সম্মেলনঃ আগামী ৭ এপ্রিল ২০১৩, রবিবার সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টে চাকদহ গৌরনগর ঘাটে (ন্যাচারাল ফরেস্ট) সারা দিন ব্যাপী এক যৌথ বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সম্মেলনে বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা ও যৌথ কর্মসূচী নেওয়া হবে। সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

'সম্পদের প্রতাপে যাঁরা আদর্শ
জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছে
তাদের সঙ্গে জীবনে
কোন সম্পর্ক গড়ব না'।
—মাদাম কুরি (১৮৬৭-১৯৩৪)

সাবধান

# লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ

বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনে বলা হয়ে থাকে — ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক সুপারিশকৃত। বস্তুটি: ডেটল লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ। অবশ্য অন্য লিকুইড হ্যান্ড ওয়াশ সম্পর্কে ভাষা অন্য থাকলেও রাসায়নিক উপাদান একই। বিজ্ঞাপনে বলা হয়, একটি বালিকা একটি বালককে বলছে - তোর সাবান স্লো নাকি? বিজ্ঞাপনের চিত্রনাট্য ও ভাষায় চাতুরীর মধ্যে মজা থাকলেও অনেক অর্ধসত্য লুকিয়ে আছে। কী, তা দেখা যাক। লেবেলে লেখা ১৭টি উপাদানের মধ্যে এগুলি ভিড় করে আছে এবং তারা লেবেল পাঠকদের সম্ভ্রম আদায় করে। সেগুলি হল ঃ কোকোমাইড-এমইএ, পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড, প্রোপাইলিন গ্লাইকল, কোকামাইডো প্রোপাইল বিটেন, ডাইসোডিয়াম ইডিটিএ, পারফিউম। এরা সবাই ক্ষতিকর।

'কোকোমাইড এমইএ' ত্বকে দহন বা বিরক্তি তৈরি করে — করতে পারে; যাদের ত্বকের অ্যালার্জি আছে তাদের 'কনট্যাকট্ ডারমাইটাটিস' হতে পারে এবং বেশি ব্যবহারে পেটে গেলে বমিভাব, শ্বাসকষ্ট, ও ডায়ারিয়া হতে পারে। পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড ত্বকের পিএইচ সমতা নষ্ট করে দিতে পারে। ক্ষয়কারী — ত্বক, চোখ ও মিউকাস মেমব্রেনের পক্ষে, যদি পি এইচ ২ শতাংশের বেশি হয় ঐ উপাদানে এবং ০.৫ শতাংশের ঘনত্বেও দহন তৈরি করতে পারে। খাদ্যনালিতে ঢুকলে যন্ত্রণা, বমি, ডায়ারিয়া, রক্তক্ষরণ, অচেতনতা ও মৃত্যু হতে পারে।

প্রোরাইলিন গ্লাইকল ত্বকের দহন বা বিরক্তি তৈরি করতে পারে, চোখে জ্বালা ধরাতে পারে এবং কনট্যাকট্ ডারমাটাইটিস হতে পারে। দীর্ঘকাল ধরে পেটে নার্ভের পক্ষে বিপদের কারণ হতে পারে — ত্বকের তেলভাব নষ্ট করে, কিডনীর অসুখ ডেকে আনে বা অসুখ থাকলে তা বাড়িয়ে দেয়, এবং প্রজনন ক্ষেত্রের ত্রুটি বা নবজাতকের ত্রুটির কারণ হতে পারে। কোকামাইডো প্রাপাইল বিটেন — সিনথেটিক কেমিক্যাল, যার মধ্যে অন্য একটি উপাদান ইমপিওরিটি হিসেবে এসে অ্যালার্জি তৈরি করতে পারে এবং কার্সিনোজেনিক নাইট্রোজঅ্যামাইনের সাথে মিশে গিয়ে বিপদ বাড়ায়।

পারফিউম বা সুগন্ধির গন্ধে শতকরা ৯৫ ভাগ কেমিক্যাল সিনথেটিক আমাদের মোহিত করে। কিন্তু অগণিত অভিযোগ আসছে, বিরূপ কুপ্রভাব তৈরি করছে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে — যেমন মাথার যন্ত্রণা, বমিভাব, মাথা ঝিমঝিম, ক্লান্তি, শ্বাস কষ্ট, মনোসংযোগের অভাব ও অ্যালার্জি। এতসব গোলমালের কাহিনী বিজ্ঞাপনের ছলনায় চাপা থেকে যায়, অথচ সাধারণ হাত ধোওয়ার সাবান থেকে এত উৎপাত নেই।

— রঞ্জিৎ পাল, ফোন ঃ (০৩৩) ২৪৭১ ৫৯০৩

২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৩

# জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের আহ্বান

আজ আমরা যে শতাব্দিতে বাস করি, সেটি একবিংশ শতাব্দি। বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান আজ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে যেমন সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে উঠেছে, তেমনি আজ বিজ্ঞান খুলে দিয়েছে মানুষের জ্ঞান চক্ষু। মানুষ আজ শিখেছে সমস্ত কিছুকে যুক্তি তর্ক দিয়ে বিচার করতে। যে সমস্ত ঘটনাগুলিকে এতকাল মানুষ অলৌকিক বলে জেনে এসেছে, আজ সেই ঘটনাগুলির পেছনের বৈজ্ঞানিক কারণগুলি তারা অনুসন্ধান করতে শিখেছে। তারা আজ আর কোনো লৌকিক ঘটনার আগে একটা "অ" বসায় না।

কিন্তু এখনও সমাজে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা বিজ্ঞানকে জানেন, অথচ মানেন না। আমাদের চরম দুঃখের বিষয় এই যে আজও অনেক বিজ্ঞান ভিত্তিক ধ্যান-ধারণার লোকেরাও সূর্যগ্রহণের সময় খোল-করতাল, ঢাক-ঢোল নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন, হাতে আঙ্গুলের থেকেও বেশি সংখ্যক আংটি ধারণ করেন, নিজেদের কষ্ট করে উপার্জন করা অর্থের অর্ধেকেরও বেশি খরচ করেন জ্যোতিষিদের পেছনে। চর্তুদশ, পঞ্চদশ শতকে যখন মানুষের বিজ্ঞান চর্চাকে পাপ বলে ধরা হত, সেই সময়ে মানুষের মনে যে সমস্ত অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনা ছিল তা কি এই ছ'শো বছর পরেও আমাদের কাম্য? আমরা তো সকলেই মহাকাশ বিজ্ঞান একটু আধটু জানি, আচ্ছা কোথাও কি আমরা রাহু ও কেতু নামে কোন গ্রহ বা কোন জ্যোতিষ্কের কথা পড়েছি? যখন কোন জ্যোতিষ হাত দেখে রাহু-কেতুর অবস্থান বর্ণনা করে, তখন আমাদের মনে কি একটুও সংশয় জাগে না? আমরা স্বামী বিবেকানন্দের কথা জানি, তিনি বলেছিলেন নিজের চোখে না দেখে, পরখ না করে কোন কিছু অন্ধ ভাবে বিশ্বাস না করতে, আচ্ছা কোনদিন কেউ সাপকে এক বাটি দুধ আর কলা খেতে দেখেছেন কি? (প্রসঙ্গত জেনে রাখুন, সাপ সম্পূর্ণ মাংসাশী প্রাণী) তাহলে কেন শুধু মানুষের মুখের কথায় সেগুলি মেনে নেন? এমন আরও শত সহস্র উদাহরণ আছে যা আজও আমাদের মাথা নত করে দেয়।

আজ ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের প্রাক্কালে আমরা বিজ্ঞান কর্মীরা চাই কুসংস্কারমুক্ত সমাজ, চাই সর্বস্তরে বিজ্ঞান চেতনার প্রচার ও প্রয়াস। দেশীয় প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রয়োগ। অপ্রচলিত প্রযুক্তির আমদানী নিষিদ্ধ করতে হবে। সমস্ত প্রচার মাধ্যমে অলৌকিক তথা অবৈজ্ঞানিক প্রচার নিষিদ্ধ হোক।

— বিজ্ঞান দরবার

যোগাযোগ—বিজ্ঞান দরবার, ৫৮৫, অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর), পোঃ কাঁচরাপাড়া ৭৪৩১৪৫, উঃ ২৪ পঃ। ফোন ঃ ০৩৩-২৫৮০-৮৮১৬, ৯৪৭৪৩০০০৯২।
সম্পাদক মন্ডলী—অভিজিৎ অধিকারী, বিবর্তন ভট্টাচার্য, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস, তাপস মজুমদার, চন্দন সুরভি দাস, চন্দন রায়, কিঞ্জল বিশ্বাস।

*স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।*

*অক্ষর বিন্যাস ঃ বিম্পা কম্পিউ, কাঁচরাপাড়া হাইস্কুল মোড়, কাঁচরাপাড়া, চলভাষ ঃ ৯৮৩৬২৭১২৫৩*

*সম্পাদক—শিবপ্রসাদ সরদার। ফোন ঃ ৯৪৩৩৩৩৪৩৮০)* E.mail-ganabijnan@yahoo.co.in